4·6

স্মরণীয় যাঁরা

৮৮৭

স্মরণীয় যাঁরা

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ দাস
বিবিধ পুস্তক-প্রণেতা

শ্রী প্রকাশনী
৭, নবীনকুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

এ কে. দাস, বি এস্-সি. ৭নং নবীন কুণ্ডু লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
শ্রীঅজিত কুমার চৌধুরী সাধনা প্রেস, ২০৬, বিধান সরনী
কলিকাতা-৭০০০০৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৮.০০

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

হুগলী জেলায় কামারপুকুর একটি ছোট গ্রাম। এই গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম চন্দ্রাবতী দেবী। তাঁহার বাল্যনাম ছিল গদাধর।

গদাধরের বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন তাঁহাকে লেখাপড়ার জন্য গ্রামের পাঠশালায় পাঠানো হইল। তিনি পাঠশালায় আসিয়াই তাঁহার মধুর ব্যবহারে গুরুমহাশয় ও সহপাঠীদের মন কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু পাঠশালার লেখাপড়ায় তাঁহার মন বসিল না। তিনি

ক্রমেই সব কিছুতেই উদাসীন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। যাত্রা, কথকতা আর ভক্তিমূলক গান শুনিতে শুনিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন।

গদাধরের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তাঁহার বাবা মারা যান। অতএব সংসারের সমস্ত ভার পড়িল গদাধরের বড় ভাই রামকুমারের উপর। আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে এবং উপার্জনের চেষ্টায় রামকুমার কলিকাতা আসিলেন। তিনি ঝামাপুকুর অঞ্চলে একটি টোল খুলিলেন। তিনি গদাধরকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কলিকাতায় নিজের কাছে লইয়া আসিলেন, কিন্তু গদাধরের ভাগ্যে অর্থকরী বিদ্যা লাভ করা হইল না।

জানবাজারের রাণী রাসমণি অতি ধর্মপরায়ণা। তিনি কলিকাতা হইতে কিছু দূরে দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথীর তীরে ভবতারিণীর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। রামকুমার এই মন্দিরের পূজারী হইলেন। রামকুমারের সহিত গদাধর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিলেন। ঠাকুরকে সাজাইবার ভার পড়িল গদাধরের উপর। আত্মভোলা গদাধর নিজের মত করিয়া ঠাকুরকে সাজাইতে লাগিলেন। রামকুমার বেশী দিন পূজারীর কাজ করিতে পারিলেন না। শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর গদাধর মন্দিরের প্রধান পূজারী নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হইতে গদাধরের জীবনের অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি মা ভবতারিণীর সেবায় একেবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে ফুল তুলিয়া নিজ হাতে মালা গাঁথিয়া মাকে পরাইয়া দিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। তিনি কখনও ভক্তি সহকারে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, কখনও বা গান গাহিতেন। মায়ের পূজায় তিনি এমনই তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, হাতের প্রদীপ হাতেই থাকিয়া যাইত। বিচিত্র তাঁহার পূজা-পদ্ধতি। মাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল।

এই ভাবে দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, মা আর তাঁহাকে দেখা দেন না। একদিন তিনি গভীর রাত্রিতে মায়ের হাতের খাঁড়া লইয়া নিজের গলায় বসাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন এমন সময় মা ভবতারিণী সত্য-সত্যই তাঁহাকে দেখা দিলেন। মাকে একবার দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি তাঁহাকে বার বার দেখিতে চাহিলেন। এ সময় হইতে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন। কখনও কখনও ভাবে বিভোর হইয়া তিনি মায়ের পূজার কথা ভুলিয়া যান। কখনও কখনও পূজার নৈবেদ্য নিজে খাইয়া ফেলেন। কখনও উহা বিড়াল কুকুরকে খাওয়ান। ইহাতে ঠাকুর বাড়ীতে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল গদাধর পাগল হইয়াছে। এই কথা রাণী রাসমণির কানে গেল। একদিন তিনি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। তিনি দেখিলেন ছোট ছেলের ন্যায় গদাধর মা ভবতারিণীর আড়ালে লুকাইয়া রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন গদাধর ঈশ্বরপ্রেমে পাগল।

এমন সময় সাধুশ্রেষ্ঠ তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। তিনি গদাধরকে দীক্ষা দিলেন। তখন তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের নাম হইল রামকৃষ্ণ। হিন্দু-শাস্ত্রানুযায়ী যাঁহারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং অসার বস্তু ত্যাগ করিয়া সারবস্তু গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে 'পরমহংস' বলা হয়। তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে 'পরমহংস' আখ্যা প্রদান করেন। তখন হইতে রামকৃষ্ণের নাম হইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

সকল ধর্মমতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সমান বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন, যত পথ তত মত। সব নদীই সাগরে যাইয়া মিশে। সব ধর্ম এক—কালী-কৃষ্ণ-খোদা-যীশুতে কোন প্রভেদ নাই। ধনী, দরিদ্র প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে দেখিতেন। তিনি গল্পের

মাধ্যমেও সরল ভাষায় ধর্মের গূঢ়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার অপূর্ব সাধনার কথা সারা দেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহার ভক্তিভাবের কথা শুনিয়া দেশ-বিদেশের বহু গুণী-জ্ঞানী লোক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। তিনি সকলকেই মিষ্ট বচনে রহস্যালাপের মাধ্যমে ধর্মোপদেশ দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশাবলী অমৃতের সমান বলিয়া উহারা 'কথামৃত' নামে পরিচিত। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বহু নাস্তিকও ভগবানে বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বহু শিক্ষিত বাঙালী শিষ্য ছিলেন। উহার মধ্যে সেরা ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তিনি পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অমূল্য বাণী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এত বড় উদার ধর্মগুরু জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। শুধু আমাদের দেশে নহে, সুদূর আমেরিকার লোকেরাও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছেন।

॥ অনুশীলনী ॥

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহার মাতা-পিতার নাম কি?

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যনাম কি ছিল? তিনি শৈশবে কোথায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন?

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যজীবন বর্ণনা কর।

৪। কিভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইলেন?

৫। কাহাদিগকে 'পরমহংস' বলা হয়? কে রামকৃষ্ণকে পরমহংস আখ্যা প্রদান করেন?

৬। রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী 'কথামৃত' নামে পরিচিত ছিল কেন?

৭। কে পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন?

নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন

রাজা রামমোহন রায় বাংলার নব জাগরণের অগ্রদূত। সে যুগের হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহার একক চেষ্টার কথা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁহার দানের তুলনা মিলে না।

হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায় ও মাতার নাম তারিণী দেবী।

রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের অধীনে উচ্চপদে কাজ করিতেন। সুতরাং তাঁহার সংসারে কোন অভাব ছিল না। রামমোহনের শৈশব-শিক্ষা গ্রামের পাঠশালাতেই আরম্ভ হয়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বাংলা ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহার পর তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য পাটনায় গমন করেন এবং অল্পকাল মধ্যে উক্ত দুই ভাষায় জ্ঞান লাভ করিয়া কাশীতে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ষোল বৎসর। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম সম্বন্ধে এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। মূর্তি পূজা সম্বন্ধে তাঁহার মনে সংশয় জাগিল। তিনি ঘোষণা করিলেন, "ঈশ্বর এক ; তাঁহার কোন ভিন্ন রূপ নাই।" এই সম্বন্ধে তিনি একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়া নিজের ধর্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে উক্ত মত ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি যাহা একবার সত্য বলিয়া জানিয়াছেন উহা হইতে বিচ্যুত হইতে সম্মত হইলেন না।

অবশেষে রামমোহন স্বীয় ধর্মমত প্রচার করিবার জন্য অজানার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত ও বহু দুর্গম পথ

অতিক্রম করিয়া তিনি অবশেষে তিব্বতে উপস্থিত হইলেন। তিব্বতের অধিবাসীরা বুদ্ধদেবের পূজারী। রামমোহন বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাদের সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিব্বতের অধিবাসীরা ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিল। কিন্তু একজন তিব্বতী মহিলার দয়ায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইল। ইহার পর তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মন দিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে দশটি ভাষার উপর তাঁহার দখল হইল। সে সময় তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতবর্ষে অতি কম ছিল।

রামমোহন ইংরেজ সরকারের অধীনে সম্মানজনক শর্তে একটি চাকরি গ্রহণ করেন। বারো বৎসর চাকরি করিবার পর তিনি উক্ত চাকরি ছাড়িয়া দেন এবং সাহিত্য-সাধনা, ধর্ম-প্রচার ও সমাজ-সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেন।

রামমোহন ছিলেন তেজস্বী পুরুষ। আদর্শের সাধনায় অন্যায়ের কাছে তিনি কখনও নতি স্বীকার করেন নাই। তিনি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। ইহাতে অসংখ্য লোক তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। পদে পদে তাঁহাকে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইল, কিন্তু তিনি দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন পদদলিত করিয়া আদর্শ প্রচার করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহার মধ্য দিয়াই তাঁহার অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিধর্মী বলিতেন, কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মকে

ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন। তিনি-ই সকলের আগে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

রামমোহন একজন বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ তাঁহার জীবনের একটি অসাধারণ কীর্তি। স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু বিধবাদের মৃত স্বামীর সহিত একই চিতায় মৃত্যু বরণ করিতে হইত। ইহাকে 'সতীদাহ প্রথা' বলা হইত। এই নিষ্ঠুর প্রথা আমাদের দেশে বহুদিন প্রচলিত ছিল। রামমোহন রায় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সাহায্যে আইনের দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিতে সক্ষম হন। এই দেশে তখন বহু বিবাহ প্রথাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। রামমোহন রায়ের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কুপ্রথার বিলোপ সাধন ঘটে। রামমোহন ছিলেন ধনী-দরিদ্র সকল মানুষের পরম বন্ধু। তিনি ছিলেন আদর্শ দেশপ্রেমিক। তাঁহার মাতৃভূমি পরাধীন ইহা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। কোন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে শুনিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীকে জাগ্রত করিতে হইলে জ্ঞানের আলো বিকিরণ করা দরকার। ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত উহা সম্ভব নয়। তাই দেশবাসীর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরেজী শিক্ষার দরুন ভারতবাসীরা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানেই পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই—ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার শক্তিও অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

রামমোহনের পূর্বে বাংলা গদ্য-সাহিত্য বলিয়া কিছু ছিল না। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্য-সাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত

থাকাকালে তিনি বহু সভা-সমিতিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ইংলণ্ডের জ্ঞানী-গুণী সমাজ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিবার ভাগ্য তাঁহার আর হইল না ; ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের ব্রিষ্টল শহরেই তাঁহার গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটিল। রামমোহন আজ আর নাই। কিন্তু দেশবাসী তাঁহার অবদানের কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। কাহাকে নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয় ? তাঁহার শৈশব-শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। রামমোহনকে একজন বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক বলা হয় কেন ?

৩। রামমোহনের তেজস্বিতা সম্বন্ধে কি জান ?

৪। সতীদাহ প্রথা কি ? এই প্রথা কে, কিভাবে দূর করিয়াছিলেন ?

৫। বাংলা গদ্য সাহিত্যে রামমোহনের দান কি ?

৬। রামমোহন বিলাতে কিরূপ সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন ?

৭। রামমোহন কোথায় এবং কত সনে মারা যান ?

কর্মযোগী বিবেকানন্দ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়া যাঁহারা বাঙ্গালী জাতিকে নূতন প্রাণ ও সত্যের সন্ধান দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। সর্বত্যাগী হইয়াও তিনি শিক্ষা ও সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী বিবেকানন্দ কলিকাতার সিমুলীয়া পল্লীতে বিশিষ্ট দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। তাঁহার বাল্য নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ডাক নাম বিলে।

নরেন্দ্রনাথ ছয় বৎসর বয়সে স্কুলে ভর্তি হইলেন। তখন হইতে তাঁহার অসামান্য স্মরণশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পাইয়া শিক্ষক-মহাশয়েরা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। প্রাইমারী পড়া শেষ করিয়া তিনি কলিকাতা মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি হন। সেখান হইতে তিনি

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পাশ করেন।

ছাত্রজীবনেই নরেন্দ্রনাথের ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ দেখা যায়। বহু পুস্তক ও শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। তখন তাঁহার মন জগতের মূল সত্য জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?" কিন্তু কেহই তাঁহার এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে পারিতেন না। অবশেষে তাঁহার এইরূপ আকুলতা দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে দেখা করিতে বলিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে ভবতারিণীর মন্দির। এই মন্দিরের পূজারী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দেখা করিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি দেবী ভবতারিণীর দর্শন লাভ করিয়াছেন?" রামকৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "দেখেছি কি রে, তাঁর সঙ্গে যে কথা বলি, যেমন তোর সঙ্গে কথা বলছি।" হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়া নরেন্দ্রনাথ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পদস্পর্শ করিয়া করিয়া বলিলেন, "আপনি কি আমাকে দেবী ভবতারিণীকে দেখাইতে পারেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরে আমি তোকে দেখাবো, আমার ন্যায় তুই-ও তাঁকে দেখতে পাবি।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই আশ্বাস বাণীতে নরেন্দ্রনাথের দেহ-মনের মধ্যে এক অপূর্ব শিহরণ জাগিয়া উঠিল।

পিতার মৃত্যুতে নরেন্দ্রনাথের উপর সংসারের ভার পড়িল। সংসারের অভাব সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, "এমন কিছু করুন যাহাতে আমাদের সাংসারিক অভাব-অনটন দূর হয়।"

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি যে মার নিকট কোন কিছু চাইতে পারি না। তুই নিজে চেয়ে নে, তুই নিজের মুখে যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন।"

নরেন্দ্রনাথ মন্দিরে যাইয়া মা ভবতারিণীকে প্রণাম করিলেন। তিনি বিশ্বজননীর মূর্তি ধ্যান করিতে করিতে অভাব অভিযোগের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। তিনি শুধু প্রার্থনা করিলেন, "মা আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও।" এইভাবে তিন বার নরেন্দ্রনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কোন বারেই মায়ের নিকট অর্থের কথা বলিতে পারিলেন না। ইহার পর হইতে নরেন্দ্রনাথের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিল। তাঁহার মধ্যে সুপ্ত এক দৈব শক্তির আবির্ভাব ঘটিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ দেখিলেন ভারতের এক ভয়াবহ চিত্র। ভারতের অসংখ্য লোক অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও শিক্ষাহীন। দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া তাহারা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি দরিদ্র, নিঃস্ব ও আর্তের সেবা করাকে তাঁহার জীবনের মহান ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি সারা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া ভারতের অতীত গৌরবের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে বিশ্ব-ধর্ম সভার অধিবেশন বসিয়াছিল। জগতের প্রায় সকল ধর্মের প্রতিনিধি সেখানে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের কোন প্রতিনিধি সেখানে আমন্ত্রিত হন নাই। স্বামীজীর মধ্যে যেন একটা ঘুমন্ত সিংহ জাগিয়া উঠিল। তিনি হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর বেশে আমেরিকা রওয়ানা হইলেন।

পথিমধ্যে অনেক দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া তিনি অবশেষে আমেরিকায় পৌঁছিলেন।

শিকাগোর রাজপথ। স্বামীজী চলিয়াছেন নিঃস্ব অবস্থায়। সঙ্গে টাকা-কড়ি কিছুই নাই। রাত্রি হইয়া আসিয়াছে। পথ-জন প্রাণী-হীন। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে রেলষ্টেশনের একধারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তুষার-শীতল রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। অবশেষে আমেরিকার এক ভদ্রমহিলার সাহায্যে তিনি বিশ্ব-ধর্মসভায় যোগদান করিতে সমর্থ হইলেন।

বিশ্ব-ধর্মসভা আরম্ভ হইয়াছে। দেশ-বিদেশের নামজাদা পণ্ডিতেরা সভায় উপস্থিত। তাঁহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিলেন। সকলের শেষে বক্তৃতা করিবার সুযোগ পাইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মাত্র পাঁচ মিনিট সময় পাইয়াছিলেন। স্বামীজী প্রথমেই সম্বোধন করিলেন, "প্রিয় ভাই ও ভগিনীগণ।"

এইরূপ মধুর সম্ভাষণ পূর্বে কেহ কখনও শুনে নাই। তাঁহার প্রথম কথাতেই তিনি আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয় করিলেন। তারপর তিনি অনর্গল হিন্দু ধর্ম ও বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। তিনি সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে একমাত্র হিন্দুধর্মই বিশ্ব-মানবতা স্বীকার করে। তাঁহার বক্তৃতায় সকলেই অভিভূত হইল। ঘন ঘন করতালি পড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসীর মুখে সারা বিশ্ব শুনিল ভারতের বিবেক-বাণী। স্বামীজীর এই বক্তৃতার ফলে আমেরিকা ও ইউরোপের শত শত লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এই সময় মার্গারেট নোবেল নামে একজন তরুণী স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিত হন। তিনি স্বামীজীর সহিত ভারতে চলিয়া আসেন এবং ভারতবাসীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

এইভাবে আমাদের দেশের বীর সন্ন্যাসী ছেলে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব জয় করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। দেশবাসীরা তাঁহাকে বিপুল সংবর্ধনা জানাইলেন। তিনি দেশের দুঃখ-দুর্দশা ও অশিক্ষা দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন নর-নারায়ণের সেবাই পরম ধর্ম। তাই তিনি নর-নারায়ণের সেবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। মহান সেবাধর্মে দীক্ষিত এই রামকৃষ্ণ মিশন আজ শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীরও গৌরব।

স্বামীজী ছিলেন কর্মযোগী। এক মুহূর্তও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রেরণায়, দরিদ্র-নারায়ণের সেবার আগ্রহে এবং অত্যধিক পরিশ্রম করার দরুন তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই এই মহাপুরুষ মহাপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ভারতের সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া গেল।

অনুশীলনী

১। নরেন্দ্রনাথ কত খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহার সংসার আশ্রমের নাম কি ছিল?

২। সংসারের অভাব দূর করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কি চাহিয়াছিলেন?

৩। নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন সম্বন্ধে কি জান?

৪। নরেন্দ্রনাথের গুরুর নাম কি ছিল?

৫। শিকাগো শহরের বিশ্ব-ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ কিরূপে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৬। রামকৃষ্ণ মিশন কে প্রতিষ্ঠা করেন?

৭। রামকৃষ্ণ মিশন কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে?

৮। স্বামী বিবেকানন্দ কত বৎসর জীবিত ছিলেন?

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর

বীরসিংহ মেদিনীপুর জেলার একটি ছোট গ্রাম। এই গ্রামে স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা-পিতা দরিদ্র হইলেও উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালায়

শিক্ষা লাভ করেন। তখন হইতেই তিনি ছিলেন অসামান্য মেধা ও বুদ্ধির অধিকারী। তার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত পিতার সহিত কলিকাতায় আসেন। কলিকাতা আসার পথে তিনি মাইলপোষ্ট দেখিয়া ইংরেজী সংখ্যা দশ পর্যন্ত শিখিয়া ফেলিলেন। এই অসাধারণ মেধা দেখিয়া ঠাকুরদাস আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন। তিনি অচিরেই তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দিলেন। ঠাকুরদাসের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তাই ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রত্যহ বাজারে যাইতে হইত এবং নিজের হাতে দুই বেলা

রাঁধিতে হইত। পড়াশুনার জন্য তিনি বেশী সময় পাইতেন না। রাত্রি জাগিয়া তিনি পড়াশুনা করিতেন। তেলের খরচ বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে রাস্তার আলোতে পড়াশুনা করিতে হইত। এত অসুবিধার মধ্যে লেখাপড়া করিয়াও তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি কলেজের পড়া শেষ করেন এবং সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন।

কলেজের পড়া শেষ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষকরূপে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমতঃ তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রূপে যোগ দান করেন এবং ক্রমে স্বীয় যোগ্যতাবলে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। এই সময় তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজও করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মসম্মানবোধ ছিল খুব বেশী। যখনই তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছে তখনই তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, এমন কি চাকুরি ছাড়িয়া দিতেও ইতস্তত করেন নাই। একবার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহিত মতবিরোধ হওয়ায় তিনি সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করেন। সরকারের সহিত শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধে তাঁহার মতের মিল না হওয়ায় তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদও ত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্থ বা ক্ষমতার লোভ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। প্রাণপণে তিনি মায়ের আদেশ পালন করিতেন। মায়ের আদেশ ছিল তাঁহার নিকট সবচেয়ে বড়। তাঁহার মাতৃভক্তি সম্বন্ধে এখানে একটি সুন্দর কাহিনী উল্লেখ করা হইল।

একবার ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ী হইতে মায়ের চিঠি পাইলেন। মা লিখিয়াছেন ছোট ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে বাড়ী যাইতে হইবে।

তিনি তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক। তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ছুটি লইয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সেকালে তখন রেল-ষ্টীমার হয় নাই। তিনি হাঁটিয়াই চলিলেন। বর্ষাকাল। পথে দামোদর নদ। দিনের পর দিন বিরামহীন বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘাটে আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন কোথাও জনমানব নাই। খেয়া নাই, আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। চারিদিকে অন্ধকার। প্রবল বাতাসে দামোদর নদ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তিনি ভাবনায় পড়িলেন। পারাপারের কোন উপায় নাই অথচ মায়ের আহ্বান। তাঁহাকে যে সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ী পৌঁছিতে হইবে। তাঁহার অভাবে মা যে মনে ভীষণ আঘাত পাইবেন। এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মাঝির অপেক্ষা না করিয়া তিনি নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া 'মা মা' বলিয়া দামোদরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দামোদরের উত্তাল তরঙ্গ উপেক্ষা করিয়া তিনি দামোদরের অপর তীরে পৌঁছিলেন এবং ভিজা কাপড়ে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর সকলেই তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, শুধু ভগবতী দেবী আলো জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। তিনি জানিতেন ঈশ্বরচন্দ্র আসিবেনই। ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বিদ্যারই সাগর ছিলেন না, দয়ার সাগরও ছিলেন। দরিদ্রের দুর্দশার কথা শুনিলে, দুঃখীর দুঃখ দেখিলে তাঁহার কোমল হৃদয় করুণায় বিগলিত হইত। তাঁহার পরোপকারিতার কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া আছে। তিনি যে কত জনকে লেখাপড়ার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন উহার ইয়ত্তা নাই। একবার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদেশে গিয়া টাকার অভাবে খুবই অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি তাঁহার দুরবস্থার কথা

জানাইয়া চিঠি লিখিলেন। বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করিয়া মাইকেলকে টাকা পাঠাইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। বিদ্যাসাগরের অন্তর ছিল কুসুমের ন্যায় কোমল এবং বজ্রের ন্যায় কঠিন। যেখানেই স্বজাতির বা দেশের কোন অবমাননা করা হইয়াছে সেখানেই বিদ্যাসাগর বজ্রের ন্যায় কঠোর হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগর একজন প্রধান সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলন বিদ্যাসাগরের জীবনের চিরস্মরণীয় কীর্তি। বাল বিধবাদের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অন্তর অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল। বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার জন্য যখন তিনি আন্দোলন আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহার নিকটতম আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবেরাও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন, এমন কি গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিলেন না। তাঁহাদের ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া তিনি সঙ্কল্পে অটল রহিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হইলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হইল। ইহার পর হইতে তিনি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ বন্ধ করিবার জন্য আমরণ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের বিদ্যা ও দানশীলতা সম্বন্ধে মাইকেল মধুসূদন লিখিয়াছেন ঃ—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভুবনে,
করুণার সিন্ধু তুমি' জানে সেই জনে
—দীন যে দীনের বন্ধু।"

বিদ্যাসাগর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে শিক্ষার অভাবই আমাদের দেশের দুর্দশার আসল কারণ। তাই তিনি শিক্ষা বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সরকারের সহায়তায় বহু বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তখনকার দিনে শিক্ষার একটি বড় অন্তরায় ছিল

পাঠ্য বইয়ের অভাব। তিনি এই অভাব দূর করিবার জন্য বহু সুপাঠ্য বই রচনা করিয়া শিক্ষার পথ সুগম করেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি বাংলা গদ্যকে মসৃণ ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়।

বিদ্যাসাগর নিজের দেশ ও জাতিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী ছিলেন। তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বেশভূষার মধ্যে ছিল পায়ে একজোড়া চটি জুতা এবং গায়ে একখানি মোটা চাদর। এই সাধারণ পোশাক পরিয়া তিনি লাটসাহেবের সহিত দেখা করিতেও ইতস্তত করেন নাই।

দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া বিদ্যাসাগর প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সারা দেশবাসী শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, দয়ালু, মহৎ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, জ্ঞানবান ও গুণবান ব্যক্তি জগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

অনুশীলনী

১। বিদ্যাসাগর কোথায় জন্মগ্রহন করেন? তাঁহার পিতামাতার নাম কি ছিল?

২। বিদ্যাসাগরের ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতা ও আত্মসম্মান-বোধ সম্বন্ধে কি জান?

৪। কে হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিয়াছিলেন? তাঁহাকে ইহা প্রচলন করিতে কিরূপ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল?

৫। বিদ্যাসাগর আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি করিয়াছিলেন?

৬। বিদ্যাসাগরের কয়েকটি গুণের পরিচয় দাও।

৭। কাহাকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয় এবং কেন?

৮। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি সম্বন্ধে কি জান?

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

'আগুন যেমন ছাই চাপা দিয়া রাখা যায় না, প্রতিভাকে সেইরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। সুযোগ পাইলেই উহার বিকাশ ঘটে। নইলে কে বলিতে পারে, যে ছেলেকে দিবারাত্র চাকর-বাকরদের কঠোর তত্ত্বাবধানে রাখা হইত, তিনিই পরবর্তীকালে 'বিশ্বকবি' নামে পরিচিত হইবেন।

কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার অতি বিখ্যাত। ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পিতামাতার কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। দেবেন্দ্রনাথ ধনে, মানে, শিক্ষায় এবং সর্বোপরি সচ্চরিত্র ও ধার্মিকতার জন্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পিতার অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। আট বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি করানো হইল। কিন্তু স্কুলের বাঁধাধরা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার মন বসিতনা। কাজেই বাড়ীতে গৃহ শিক্ষকের নিকট তাঁহার পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হইল। শৈশব কালেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটে।

সতের বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলাত গমন করেন। সেখানে ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলে তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করেন। অতঃপর তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশের আলো ও বাতাস পাইয়া তাঁহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি ইচ্ছামত কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পর পর রচিত হইল 'মানসী'

'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য', 'শিশু', 'খেয়া' প্রভৃতি কাব্য। তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির বিরাম ছিল না।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন বিশ্বের বিস্ময় 'গীতাঞ্জলি'। এই গীতাঞ্জলি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। ইহার ফলে সারা বিশ্বে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর গৌরব বৃদ্ধি পাইল।

বাংলা ভাষা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। পৃথিবীর চারিদিক হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। অতঃপর তিনি চীন, জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া বিশ্বপ্রেমের অমৃত বাণী শুনাইতে লাগিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথের দান কম নয়। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলা দেশকে বিভক্ত করিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশময় আন্দোলন আরম্ভ হইল। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি উহার প্রতিবাদে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ও স্বদেশ-মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন এবং উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহু গান রচনা করিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীত, দেশবাসীর মনে এক নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিল। অবশেষে এই আন্দোলন সফল হইল। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দৃঢ়চেতা ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি। ১৯১৯

সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ সরকার এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। এই হত্যাকাণ্ডের খবর শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মানবপ্রেমিক কবি স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ইংরেজদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করিলেন। এই ঘটনায় দেশবাসী তাঁহাকে ধন্য ধন্য করতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ শৈশবকাল হইতে সুকণ্ঠ ছিলেন। তিনি খুব উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ ও অভিনেতা ছিলেন। বর্তমানে তাঁহার সুর লহরী আকাশ-বাতাস মাতাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহার রচিত 'জনগনমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য-বিধাতা' গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আজ ঘরে ঘরে তাঁহার এই গান গীত হয়।

শুধু কবিতা নয়, গল্প, নাটক, উপন্যাস সব কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি সমাজ-সেবীও ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী ও জ্ঞানের সাধক। শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহার দানের তুলনা মিলে না। তিনি বীরভূম জেলার বোলপুরে শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতির ক্রোড়ে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহা প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। ইহা আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। বিদেশে ইহার পরিচয়—'ইণ্টারন্যাশনাল্ ইউনিভার্সিটি অব্ ডক্টর টেগার।' এখানে পৃথিবীর বহু ভাষা ও জ্ঞান-চর্চার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন দেশের অধ্যাপক ও ছাত্র জ্ঞান-দান ও জ্ঞান-লাভ কার্যে নিযুক্ত আছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার এক অপূর্ব কীর্তি।

১৩৪৮ সনের ২২শে শ্রাবণ এই মহাকবি আশি বৎসর বয়সে মর্তধাম হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি আজ ইহজগতে নাই। কিন্তু যতদিন বাংলা সাহিত্য থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এমন বহুমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবীতে খুব

কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শুধু বাংলার গৌরব ছিলেন না, সারা পৃথিবীর গৌরব ছিলেন। আমরা তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত।

অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের পিতার নাম কি। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। রবীন্দ্রনাথ কত খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? তাঁহার শৈশব-শিক্ষা সম্বন্ধে কি জান?

৩। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ কখন এবং কি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন?

৪। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে কি জান?

৫। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি? সে সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬। রবীন্দ্রনাথের রচিত কোন্ গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে?

৭। রবীন্দ্রনাথ কোন্ সনের কোন্ তারিখে মারা যান।

———

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলার গৌরব সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত কাঁঠালপাড়ায় ছিলেন। তিনি কিছুকাল তাঁহার গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন। অতঃপর তিনি মেদিনীপুরে পিতার কর্মস্থলে চলিয়া আসেন। তখন মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এফ্ টিড নামক একজন ইংরেজ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় কাঁঠাল-পাড়ায় ফিরিয়া আসেন এবং কিছুকাল পণ্ডিত শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের কাছে সংস্কৃত ও বাংলা কাব্য অধ্যয়ন করেন।

বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। যখন তাঁহার সমবয়সীরা খেলাধূলা করিয়া বেড়াইত তখন তিনি ঘরে বসিয়া আপন মনে পড়াশুনা করিতেন। তাঁহার সঙ্গীরা ইহাতে তাঁহাকে ঠাট্টা করিত, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত সত্যপরায়ণ ছিলেন। কেহ কখনও মিথ্যা কথা বলিলে তিনি তাঁহার প্রতি রাগ করিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের জন্য সহপাঠীদের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ভাব ছিল। শিক্ষক মহাশয়গণও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজের জুনিয়ার বিভাগে ভর্তি হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র এগার বৎসর। তাঁহার মেধা ছিল অসাধারণ। তিনি হুগলী কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায়

সকল বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া দুই বৎসরের জন্য কুড়ি টাকা বৃত্তিলাভ করেন। অতঃপর ১৮৫৬ সনে তিনি হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে দুইজন প্রথম বি. এ. পাস করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। বি. এ. পাস করিবার পর

বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ লাভ করেন। তাঁহার প্রথম কর্মস্থল ছিল যশোহর। ইহার পর তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। প্রত্যেক জায়গাই তিনি তাঁহার কর্মদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন তেমনি ছিলেন অসামান্য স্বদেশ-প্রেমিক। তাঁহার রচিত অধিকাংশ গ্রন্থে তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের উচ্ছ্বাস সুপরিস্ফুট। তিনি অসামান্য প্রতিভা লইয়া

বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সৃজনী-প্রতিভা ছিল বহুমুখী। উপন্যাস, প্রবন্ধ, রস-রচনা যেখানেই তিনি হাত দিয়েছেন, সেখানেই সোনা ফলাইয়াছেন।

তাঁহার অমর লেখনী স্পর্শে বাংলা ভাষা এক সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হইল। তিনি যখন সাহিত্যরচনা আরম্ভ করেন তখন বাংলা ভাষার মাত্র জন্ম হইয়াছে। আজ যে বাংলা ভাষা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে উহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার এক অবিস্মরণীয় অবদান।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'আনন্দমঠ' বাঙ্গালী জাতিকে জাতীয়তা বোধের দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিল। তাঁহার এই অমূল্য রচনার মধ্য দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন কি করিয়া দেশকে ভালবাসিতে হয় এবং কি করিয়া দেশের স্বাধীনতার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিতে হয়। দেশকে প্রণতি জানাইবার জন্য আনন্দমঠের সন্তানদিগের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র যে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র দিয়াছিলেন, উহা দেশাত্মবোধের বীজমন্ত্র। আজ সেই মন্ত্রই আমাদের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হয়। আজ বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সার্থক হইয়াছে। দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। আমাদের পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিবার নিমিত্ত অনেকে সংগ্রাম করিয়াছেন—কেহ অসির সাহায্যে, কেহ মসীর (লেখনীর) সাহায্যে। মসীবীর বঙ্কিমচন্দ্রের দান এ বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহার মধ্যে 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ', 'কপালকুণ্ডলা', 'দুর্গেশ নন্দিনী', 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু বাংলায় নহে ইংরেজী রচনাতেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য শেষ জীবনে মোটেই ভাল ছিল না। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বহুমূত্র রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আজ ইহ জগতে

নাই বটে, কিন্তু যতদিন বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে।

অনুশীলনী

১। কাহাকে সাহিত্য সম্রাট বলা হইয়াছে? তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২। বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কি জান?

৩। বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের দান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থের নাম কর।

৫। 'বন্দেমাতরম্' সংগীত কে রচনা করিয়াছিলেন? ইহা কিসের সংগীত ছিল?

৬। বঙ্কিমচন্দ্র কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কি রোগে মারা যান?

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু

পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান সাধকের জন্মদিন উপলক্ষে একবার উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানীকে প্রশস্তি গাহিয়া এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

কে এই প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-সাধক, যিনি বিশ্বের বিজ্ঞান-সভায় ভারতবর্ষের সম্মানিত আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? তিনি বিজ্ঞানাচার্য

জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি শুধু বাংলার নন, সারা পৃথিবীর গৌরব। এইবার তাঁহার পরিচয় ও জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে তোমাদিগকে সংক্ষেপে বলিতেছি।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলা দেশের) ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় রাঢ়িখাল্ গ্রামে জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভগবানচন্দ্র বসু। তিনি ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

শৈশবে ফরিদপুরের ছোট একটি বিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্রের লেখাপড়া আরম্ভ হয়। সেখানে যাহারা লেখাপড়া করিত তাহারা অধিকাংশই ছিল গরীবের ছেলে। তাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র ছিলেন আলাদা। তিনি ধনীর ছেলে ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চালচলন ছিল অতি সাধারণ এবং স্বভাব ছিল অতি মধুর। বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁহার চোখমুখ ছিল উজ্জ্বল এবং ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন সকলের সেরা। সেখানকার পাঠ শেষ করিয়া তিনি কলিকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। সেখান হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। কলেজে পড়িবার সময় হইতেই তাঁহার বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী পড়িবার উদ্দেশ্যে বিলাত গমন করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার দরুন তিনি ডাক্তারী পড়া ছাড়িয়া দিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট কলেজে বিজ্ঞান পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার প্রতিভা উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল। তিন বৎসরের মধ্যে সেখান হইতে বিজ্ঞানের উচ্চ ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বদেশে ফিরিয়া জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সে সময় এই কলেজে বিদেশী অধ্যাপকদের তুলনায় দেশীয় অধ্যাপকদের বেতন ছিল কম। জগদীশচন্দ্র কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থাকে অপমানজনক মনে করিলেন এবং তাঁহাদের অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-স্বরূপ তিন বৎসর পর্যন্ত সেখানে

বিনা বেতনে চাকরি করিলেন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত বিজ্ঞান-সাধক। তাঁহার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি কলেজে অধিকাংশ সময় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত থাকিতেন। ক্রমে দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁহার গবেষণার মূল্য উপলব্ধি করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-এস-সি উপাধি প্রদান করেন। আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বেতারে যে সংবাদ পাঠানো হইতেছে, সর্বপ্রথম ইহার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এই বাঙালী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র। বেতার যন্ত্র আবিষ্কারে তাঁহার সাফল্য প্রমাণিত হইলেও দুর্ভাগ্যবশত সেই আবিষ্কারের সহিত ইটালির বৈজ্ঞানিক মার্কনি সাহেবের নাম জড়িত হইল। জগদীশচন্দ্র ইহাতে মনে আঘাত পাইলেন বটে, কিন্তু দমিলেন না। তিনি নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া আবার তাঁহার গবেষণা-কার্য আরম্ভ করিলেন। এইবারের গবেষণার বিষয়বস্তু হইল উদ্ভিদ। তিনি অসাধারণ ধৈর্য, পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা এক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন। সারা পৃথিবীর মানুষকে বিস্মিত করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন, গাছপালারও চেতনা আছে, তাহারাও সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা অনুভব করে। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান-জগতে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। তখন জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িল। নানা দেশ হইতে তাঁহার অভিনন্দন আসিতে লাগিল। ইউরোপের বহু বৈজ্ঞানিক তাঁহাকে ইউরোপে থাকিয়া অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ছিলেন স্বদেশ-প্রেমিক বৈজ্ঞানিক। তিনি ভারতবর্ষকে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশকে প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসিতেন। দেশের কল্যাণ সাধনই ছিল

তাঁহার একমাত্র কামনা। তাই তিনি দেশে থাকিয়া বিজ্ঞান-সাধনা করিবেন স্থির করিলেন। তিনি একখানি চিঠিতে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, "আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বার যেন এই ভারতেই জন্মগ্রহণ করি।" তাঁহার এই দেশপ্রীতির উদাহরণ সত্যই অসাধারণ।

প্রতিভার পুরস্কার হিসাবে জগদীশচন্দ্র সরকারের নিকট হইতে বহু উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বিলাতে 'রয়েল সোসাইটি' নামে যে সমিতি আছে উহার সদস্য-পদ যে-সে লাভ করিতে পারে না। জগদীশচন্দ্র তাঁহার অসামান্য প্রতিভার দরুন সেই সদস্য-পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বাংলাদেশে বাঙালী যুবকদের বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করিবার সুযোগ অতি অল্প। তাই তিনি তাঁহার উপার্জনের অধিকাংশ অর্থ ব্যয়ে এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার নির্মাণ করিলেন। ইহার নাম 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। ইহা জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এখানে শত শত বৈজ্ঞানিক নব নব তত্ত্ব আবিষ্কারে রত আছেন। এই গবেষণাগারের ভিত্তি স্থাপন করিবার সময় জগদীশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সর্বজাতির সকল নর-নারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে।"

বৈজ্ঞানিক হইলেও জগদীশচন্দ্র একজন সুলেখক ছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁহার রচিত 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধটি একটি উৎকৃষ্ট রচনা। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান সাধনায় অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিলেও তিনি কিছুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্র যখন তাঁহার গবেষণাগারে গবেষণার কাজে তন্ময় হইয়া থাকিতেন তখন অনেক সময় আহারাদির কথা ভুলিয়া যাইতেন। বিজ্ঞান সাধনায় কঠোর পরিশ্রম করার দরুন অবশেষে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত তিনি গিরিডিতে গমন করেন। সেখানেই ভারতমাতার সুসন্তান, এই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরলোক গমন করেন। জগদীশচন্দ্র চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি দেশবাসীর জন্য যে অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন উহার তুলনা নাই। তিনি নব ভারতের বিজ্ঞান সাধনায় পথিকৃতদের অন্যতম। সারা বিশ্ব শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিবে।

অনুশীলনী

১। জগদীশচন্দ্রের শৈশব-শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত কোন্ বিষয়ে তাঁহার মত-বিরোধ ঘটে? ইহার ফল কি হইয়াছিল?

৩। জগদীশচন্দ্রের দুইটি শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। বাঙালী যুবকদের বিজ্ঞান সাধনার জন্য জগদীশচন্দ্র কি করিয়াছিলেন?

৫। জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬। জগদীশচন্দ্র কোথায় মারা যান?

বাংলার বাঘ আশুতোষ

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলিকাতার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাঁহার বাড়ী ছিল ভবানীপুরে। তাঁহার বাড়ীতে অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বেড়াইতে আসিতেন। ইহার মধ্যে একজন ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি। গঙ্গাপ্রসাদের ছোট একটি ছেলে অতি মনোযোগ সহকারে এই ভদ্রলোকের কথা শুনিত। তাঁহাকে দেখিলে সে আর কোথাও যাইতে চাহিত না। তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত। বাড়ীর সকলেই ইহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারা একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা জজ-সাহেব আসিলে তুমি তাহার নিকট যাইতে চাও কেন?" বালকটি দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি বড় হইলে তাঁহার মত জজ হইতে চাই।" পরবর্তীকালে বালকটির এই বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল! তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম কি জান? তাঁহার নাম স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁহাকে 'বাংলার বাঘ' বলা হইত। সত্যই বাঘের ন্যায় ছিল তাঁহার তেজ। একবার যে কাজ করিবেন বলিয়া তিনি সংকল্প করিতেন, শত বাধা-বিপত্তিও তাঁহাকে সে কাজ হইতে বিরত করিতে পারিত না। তিনি জীবনে কাহারও নিকট নতি স্বীকার করেন নাই।

আশুতোষের তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও বীরত্বের অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্যাড্‌লার সাহেব এক কমিশন বসাইয়াছিলেন। আশুতোষ ছিলেন এই কমিশনের একজন সদস্য। একবার তিনি উক্ত কমিশনের সদস্যরূপে কোন কলেজে পরিদর্শন করিতে যাইয়া দেখিলেন একজন ইতিহাসের

সাহেব-অধ্যাপক ইংরেজী পড়াইতেছেন। আশুতোষ তাহাকে বলিলেন, 'তুমি ইতিহাসের এম. এ. ইংরেজী পড়াইতেছ কেন?"
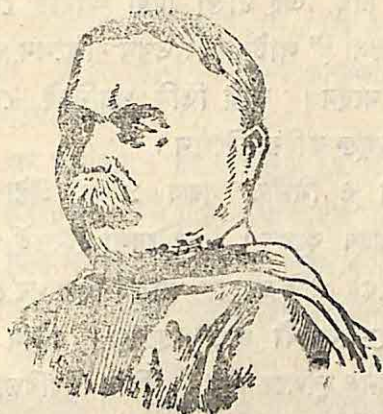
সাহেব আশুতোষের মুখে এই কথা শুনিয়া নিজেকে অপমানিত বোধ করিলেন এবং বলিলেন, 'এটা আমাদের জন্মগত অধিকার।' আশুতোষ তখন বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটা কি তোমাদের দেশের মুচিরও অধিকার?' সাহেব আশুতোষের কথায় লজ্জায় মাথা নীচু করিলেন!

পূর্বে কলিকাতার রেড রোড দিয়া কোন ভারতীয় চলাফেরা করিতে পারিত না। কেবল ইংরেজরাই এই রাস্তা দিয়া চলাফেরা করিতে পারিত। তাই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'রেড রোড'। একবার আশুতোষ জুড়ি-গাড়ী চড়িয়া সেই রাস্তা দিয়া যাইবার সময় একজন ইংরেজ পাহারাওয়ালা তাঁহার গাড়ির পথ আটকাইল। আশুতোষ তাহাকে এক ধমক দিয়া গাড়ী লইয়া চলিয়া গেলেন। বাড়ী ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাটসাহেবের নিকট ফোন করিয়া বলিলেন, "আমি জানতে চাই 'রেড রোড' দিয়া আমাদের যাতায়াতের অধিকার আছে কিনা?" লাট সাহেব উত্তর করিলেন, "আপনি সব

রাস্তা দিয়াই চলাফেরা করিতে পারেন।" আশুতোষ তাঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি লাটসাহেবকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি জানতে চাই, এই রাস্তা দিয়া আমার দেশবাসীর চলার অধিকার আছে কিনা ?" লাটসাহেব তখন বুঝিলেন আশুতোষ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাই তিনি পরদিনই 'রেড রোড' সর্ব-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

এই তেজস্বী ও নির্ভীক পুরুষ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা হইতেই পড়াশুনার প্রতি, বিশেষ করিয়া অঙ্কের প্রতি তাহার আগ্রহ ছিল খুব বেশী।

তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি একবার যাহা শুনিতেন উহা কখনও ভুলিতেন না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এম. এ. পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিদ্যায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তিনি প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক, ন্যায়পরায়ণ ও আইনজ্ঞ বিচারক অত্যন্ত বিরল।

শুধু আইনজ্ঞ হিসাবে নয়, শিক্ষা-সংস্কারক হিসাবেও আশুতোষ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। আট বৎসর কাল তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই আট বৎসরে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে গৌরবময় প্রতিষ্ঠা দান করিয়া গিয়াছেন। পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. পড়িবার ব্যবস্থা ছিল না। তিনি-ই বাংলা ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। শুধু তাঁহার চেষ্টাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের

মধ্যে সম্মানজনক স্থান দখল করিয়াছে। বাংলা দেশে প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কার সাধন ও উন্নতি বিধান করাই ছিল তাঁহার জীবনের ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা। তাঁহার প্রবর্তিত নিয়ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজিও অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

আশুতোষ ছিলেন মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালী। তিনি বাঙালীর ধুতি চাদরকেই শ্রেষ্ঠ পোশাক বলিয়া মনে করিতেন। এই পোশাকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল গভীর। স্যাড্লার কমিশনের বৈঠক উপলক্ষে তিনি মহীশূরের মহারাজার ভোজ-সভায় নিমন্ত্রিত হন। মহারাজার সঙ্গে খালি মাথায় দেখা করার রীতি ছিল না। আশুতোষ শুধু চাদর পরিয়া আসিয়াছেন। মহারাজার সেক্রেটারী তখন তাঁহাকে বলিলেন, "এখানে খালি মাথায় আসিবার কোন নিয়ম নাই। আপনি দয়া করিয়া পাগড়ি বা টুপি পরিয়া আসুন।" আশুতোষ তখন উত্তর করিলেন, "আমি জাতীয় পোশাক কখনও ত্যাগ করিব না।" এই কথা বলার পর তিনি রাজ-দরবার ত্যাগ করিলেন।

মহারাজার কানে এই খবর পৌঁছিতেই তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তখন তাঁহার সেক্রেটারী আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আশুতোষকে ভোজ-সভায় লইয়া গেলেন। এই রকম ছিল আশুতোষের ব্যক্তিত্ব।

আশুতোষের মাতৃভক্তি ও তেজস্বিতা ছিল অসাধারণ। মায়ের ইচ্ছা পূরণ করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। একবার বাংলা দেশের গভর্নর লর্ড কার্জন আশুতোষকে বিলাত যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। আশুতোষ তাহাকে বলিলেন যে, তাঁহার মা তাঁহাকে বিলাত যাইতে দিবেন না। ইহাতে লর্ড কার্জন বলিলেন, "আশুতোষ যেন মাকে জানান যে স্বয়ং লাটসাহেব তাঁহাকে বিলাত যাইতে বলিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া আশুতোষ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া জবাব দিলেন, "আমার মায়ের আদেশের চেয়ে পৃথিবীর কাহারও আদেশই আমার নিকট বড় নয়। অতএব আমি কিছুতেই মায়ের আদেশ অমান্য করিতে পারিব না।" আশুতোষের অসাধারণ মাতৃভক্তি ও তেজস্বিতা দেখিয়া লর্ড কার্জন মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আশুতোষ ছিলেন ছাত্র-দরদী। তিনি ছাত্রদের অন্তর দিয়া ভালবাসিতেন। তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার গৃহে ছাত্রদের অবাধ গতি ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় 'ছাত্র কল্যাণ সমিতি' গঠিত হইয়াছিল।

১৯২৪ সনে মাত্র তিন দিন রোগভোগের পর বাংলার এই গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হইল।

অনুশীলনী

১। আশুতোষের ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। আশুতোষকে 'বাংলার বাঘ' বলা হইত কেন?

৩। আশুতোষের মাতৃভক্তি ও তেজস্বিতা সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ কর।

৪। আশুতোষ যে খাঁটি বাঙালী ছিলেন মহীশূরের মহারাজার ঘটনা উল্লেখ করিয়া উহার বিবরণ দাও।

৫। ছাত্রদের প্রতি আশুতোষের দরদ ছিল কিরূপ?

৬। আশুতোষের শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে কি জান?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

স্বদেশ সেবায় যাঁহারা ব্যক্তিগত অর্থ ও সুখসুবিধা বিসর্জন দিয়া আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারাই দেশের প্রকৃত বন্ধু। চিত্তরঞ্জন দাশ উপরি-উক্ত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন বলিয়া দেশবাসী তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বাংলার ঘরে-ঘরে সুপরিচিত। বাংলা মায়ের এই কৃতি-সন্তান ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার তেলিরবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভুবনমোহন দাশ ছিলেন একজন খ্যাতনামা এটর্নী। তাঁহার আয় ছিল যেমন প্রচুর, হৃদয়ও ছিল তেমন মহৎ। দান-ধ্যানের বেলায়ও তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্বে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলে আইন অনুযায়ী তাঁহার ঋণের টাকা শোধ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য পুত্র চিত্তরঞ্জন পাওনাদারদের ডাকিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। পাওনাদারগণ চিত্তরঞ্জনের সততা ও পিতৃভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন যে সততার এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

চিত্তরঞ্জন ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান হইতে বি. এ. পাস করেন। অতঃপর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি বিলাত গমন করেন। বিলাতে চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এমন সময় দাদাভাই নওরোজী বিলাতী পার্লামেণ্টের সদস্যপদ-প্রার্থী হইলেন। একজন ভারতীয় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হইবে, ইহা ইংরেজদের সহ্য হইল না। তাহারা

উহার বিরুদ্ধে নানাভাবে কুৎসা রটনা করিল এবং ভারতবর্ষকে কালো আদমীর দেশ বলিয়া অভিহিত করিল। চিত্তরঞ্জন ইংরেজদের এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া লণ্ডনে এক বিরাট প্রতিবাদ সভার আয়োজন করিলেন। সেই সভায় তিনি ইংরেজনীতির বিরুদ্ধে জোরালো বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দেশকে প্রাণদিয়া ভালবাসিতেন। তাঁহার বক্তৃতা

শুনিয়া ইংরেজ শাসকগণ ক্রুদ্ধ হইলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার যে অনুমতি তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল উহা ফিরাইয়া লওয়া হইল। অতঃপর চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং যথাসময়ে উক্ত পরীক্ষায় পাস করিয়া বাংলার বুকে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বদেশে ফিরিয়া চিত্তরঞ্জন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে আলিপুরে বোমার মামলা আরম্ভ হইল। এই মামলায় যাঁহারা আসামী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদের অন্যতম। চিত্তরঞ্জন তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মামলা চালাইতে লাগিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে সওয়াল করিবার সময় চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "আজ যে লোকটি আসামীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছেন তিনি একজন অসামান্য ব্যক্তি। বাহিরের বহু বিরূপ ঘটনা এবং মনের অনেক বিরুদ্ধ ভাব আসল মানুষটিকে লোক-চক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। যেদিন সেই-সব ঘটনা থাকিবে না, মনের উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া যাইবে, সে-দিন সত্যকার মানুষটি আমরা দেখিতে পাইব। সে-দিন তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সারা দেশের লোক, এমন কি, দূর দেশের লোক অবধি কান পাতিয়া থাকিবে।" শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন যে কথা বলিয়াছিলেন উহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন আলিপুর বোমার মামলা পরিচালনা-কালে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা ও আইন-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্যই শ্রীঅরবিন্দ ও বিপ্লবীদের আরো অনেকে মুক্তিলাভ করিলেন। বিচারক রায় লিখিবার সময় চিত্তরঞ্জনের আইন-জ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই চিত্তরঞ্জন হইলেন দেশের সেরা ব্যারিষ্টার। তাঁহার পসার ও প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতির চরম শিখরে উন্নীত হইলেন।

তখন তাঁহার মাসিক আয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দাঁড়াইল। তাঁহার মত আয় সে যুগে খুব কম লোকেরই ছিল। আয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দানের পরিমাণও বাড়িয়া গেল। একবার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট কন্যার বিবাহের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য চাহিলেন। ব্রাহ্মণের মলিন বেশ ও শুষ্ক মুখ। তাঁহার পায়ে জুতা নাই। তাঁহার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মণের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "বিকালে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। আজ যাহা রোজগার হইবে সবই আপনাকে

দিয়া দিব।” ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। বিকাল-বেলা চিত্তরঞ্জন হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতীক্ষায় বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। চিত্তরঞ্জন পকেট হইতে পাঁচ হাজার টাকার একটা নোটের তাড়া বাহির করিয়া বলিলেন, “এই নিন, আমার আজকের রোজগার পাঁচ হাজার টাকা।” নোটের তাড়া পাইয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দুই হাতে আশীর্বাদ করিতে করিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া চিত্তরঞ্জনের দিন পরম সুখেই অতিবাহিত হইতেছিল। অর্থ, যশ, মান কোন কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। এবার শুরু হইল তাঁহার ভোগ-বিলাসের পালা। তিনি দেশের ভোগী ও বিলাসীদের আদর্শস্থল হইয়া উঠিলেন। এমন সময় ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী ‘অসহযোগ আন্দোলন’ আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, “অসহযোগ আন্দোলন সফল করিতে হইলে সকল আইনজীবীকে আদালত ত্যাগ করিতে হইবে।”

স্বাধীনতার স্বপ্নে যাঁহার হৃদয় একবার মাতিয়া উঠিয়াছে, অর্থ তাঁহাকে বেশীদিন বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। চিত্তরঞ্জনের ক্ষেত্রেও উহার অন্যথা হইল না। তাঁহার দৈনিক আয় তখন দুই হাজার টাকারও বেশী। গান্ধীজীর আহ্বান তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি রাজার মত বিভব ও বিলাস পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি সমস্ত বিলাতী জিনিস, বিলাস ও যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক নিমেষে ফকির সাজিলেন। তিনি দেশের জন্য দারিদ্র্য, কারাবাস ইত্যাদি সব রকম কষ্ট প্রশান্তচিত্তে ও হাসিমুখে বরণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ‘দেশবন্ধু’ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের পদ লাভ করিয়া কলিকাতাবাসীর উন্নতির জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেসের সহিত তাঁহার নীতিগত বিরোধ দেখা দিলে তিনি 'স্বরাজ্য দল' নামে একটি নূতন দল গঠন করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে সেই দলের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। পরে এই স্বরাজ্য দল কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবনও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী হিসাবেই আরম্ভ হইয়াছিল।

দেশপ্রেমিক, দাতা, ত্যাগী ও ব্যারিষ্টার-শ্রেষ্ঠ – ইহাই শুধু চিত্ত-রঞ্জনের পরিচয় নয়, কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান কম নয়। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠ দেশসেবকরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি কলিকাতার নিজ ভবনটি পর্যন্ত জন-কল্যাণের উদ্দেশ্যে দান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে উহা 'চিত্তরঞ্জন সেবা সদন' নামে পরিচিত। দেশের সেবায় বার বার কঠোর পরিশ্রম করার দরুন অবশেষে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি দার্জিলিং গমন করেন। কিন্তু সেখানে তাহার স্বাস্থ্য আরও ভাঙিয়া গেল এবং সেখানেই তিনি সকলকে কাঁদাইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনীত হইলে শিয়ালদহ ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য হইল। সেখান হইতে পুষ্পমালা ভূষিত তাঁহার মৃতদেহ যখন কেওড়া-তলা শ্মশানঘাটে আনীত হইয়াছিল, তখন অসংখ্য শোক-বিহ্বল নরনারী তাহার মৃতদেহের অনুগমন করিয়াছিল। এইরূপ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য আর কখনও দেখা যায় নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অন্তরের কথা লিখিয়াছিলেন—

"এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাই তুমি
করে গেলে দান"।

বাস্তবিকই মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হইয়া যায়না। কালের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাদের চিন্তাধারা মানব জাতিকে যুগে যুগে মহৎ প্রেরণা জোগায়।

অনুশীলনী

১। 'দেশবন্ধু' বলিতে কাহাকে বুঝায়? তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' বলা হয় কেন?

২। চিত্তরঞ্জনের বিদ্যাশিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া চিত্তরঞ্জনের দানশীলতার পরিচয় দাও।

৪। ব্যারিষ্টার হিসাবে চিত্তরঞ্জন কিরূপ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন?

৫। কংগ্রেসের সহিত মতান্তর ঘটায় চিত্তরঞ্জন কোন্ রাজনৈতিক দল গঠন করিয়াছিলেন? রাজনীতিক্ষেত্রে সেই দলের ক্ষমতা ছিল কিরূপ?

শ্রীঅরবিন্দ

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়। তাঁহার আদি নিবাস ছিল কোন্নগর। তাঁহার পিতার নাম ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। তিনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে পুত্রগণকে ইংরেজী আদর্শে শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। অরবিন্দ শৈশবে কিছুদিন দার্জিলিং সেণ্ট পল্‌স স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া সতের বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন এবং দশম স্থান অধিকার
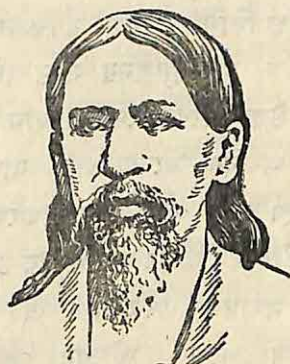
করেন। কিন্তু অশ্বারোহণ-বিদ্যার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ট্রাইপশে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসিয়া অরবিন্দ বরোদার রাজকলেজে প্রথমে অধ্যাপক হন ও পরে সহকারী অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। তিনি বিদেশে শৈশব ও যৌবনের একাংশ অতিবাহিত করা সত্ত্বেও মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে একদিনের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই।

তিনি সুদূর বিদেশে থাকিয়াও স্বাধীনতা ও স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ইউরোপবাসীর স্বাধীনতার স্পৃহার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। দেশে ফিরিয়া তিনি স্বদেশের কাজে ও স্বাধীনতা প্রয়াসে আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁহার মধ্যে ছিল এক দিব্য জীবনের প্রবাহ। দেশমাতার প্রতি ছিল তাঁহার অচলা ভক্তি। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানদলের ভাবাদর্শ তাঁহাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশকে মুক্ত করিতে হইলে সক্রিয় আন্দোলন করা একান্ত প্রয়োজন। দেশমাতাকে তিনি মাতৃরূপে বর্ণনা করেন এবং তাহার মুক্তির জন্য তিনি জাতিকে যে-কোন মূল্য দিতে বলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি বরোদা হইতে বাংলায় আসেন এবং উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' নামক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইহার মাধ্যমে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার বিচক্ষণ অধ্যক্ষতায় উক্ত পত্রিকা অবিলম্বে জনসমাজে অত্যধিক সমাদর লাভ করে। এই সময় হইতেই তাঁহার যশঃ ভারতময় ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা, ভাবের গভীরতা ও যুক্তির সারবত্তায় সকলেই মুগ্ধ হন। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর তিনি কিছুদিন 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন।

অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের জনক। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজদ্রোহী-ও ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ধৃত হইয়া বন্দী হন। আলীপুরে বোমার মামলায় অন্যান্য সহকর্মীদের সহিত তাঁহার বিচার হয়। বিচারের সময় তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা

করিয়াছিলেন, "দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়। তাহা হইলে আমি সেই অপরাধে অপরাধী।" এই মামলায় বিখ্যাত ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার অকাট্য যুক্তিতে এবং কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে আদালতের বিচারে অরবিন্দ সম্পূর্ণ নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়া মুক্তি লাভ করেন।

অতঃপর অরবিন্দ রাজনৈতিক ও সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া পণ্ডিচেরীতে নির্জনে ভগবৎ চিন্তায় মনোনিবেশ করেন এবং 'শ্রীঅরবিন্দ' নামে বিশ্বপরিচিতি লাভ করেন। অরবিন্দ ছিলেন বিপ্লবী, যোগী, ঋষি। তাঁহার সাধনার লক্ষ্য ছিল মানবজাতির মুক্তি। তাঁহার অধ্যাত্মশক্তি ও দূরদৃষ্টি ছিল অসামান্য। তাঁহার তুল্য বিদ্বান, উদারচেতা, আত্মত্যাগী ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে সমাধিস্থ অবস্থায় দেহরক্ষা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

অনুশীলনী

১। শ্রী অরবিন্দ কে ছিলেন? তাঁহার পিতার নাম কি? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২। তাঁহার কার্যাবলী বর্ণনা কর।

৩। তাঁহার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হইয়াছিল? তিনি কিভাবে অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইলেন?

৪। শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশ-প্রীতি সম্বন্ধে কি জান?

৫। শ্রীঅরবিন্দের শেষ জীবন সম্বন্ধে কি জান লিখ?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

এই পৃথিবীতে প্রত্যহ অসংখ্য মানুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে, অসংখ্য মানুষ ইহলোক ত্যাগ করিতেছে। কেহই উহার খবর রাখে না। কিন্তু উহাদেরই ভিতরে এমন এক-একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার যশোগৌরব পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়। আজ তোমাদেব নিকট এমনি একটি মানুষের নাম করিব। তিনি আমাদের বাংলা মায়ের কৃতী-সন্তান। তাঁহার নাম সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁহার পিতার নাম জানকীনাথ বসু ও মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। জানকীনাথ কটক শহরে প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন।

ছেলেবেলা হইতেই সুভাষচন্দ্র দেশ ও দেশের মানুষকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। রোগীর সেবা করা এবং গরীব দুঃখীর দুঃখ দূর করা ইত্যাদি ব্যাপারে তখন কটক শহরে ছেলেদের মধ্যে তাঁহার জুড়ি কেহ ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখে পড়িল ভারতবর্ষের ভয়াবহ ছবি—ক্ষুধায় কাতর, রোগে ম্লান, অশিক্ষায় মূঢ় ভারতবাসী দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। তখন ভারত ছিল ইংরেজদের অধীন। ইংরেজরা ভারতের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া উহাকে সর্বহারা করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন ইংরেজদের এদেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে আমাদের দেশবাসীর দুঃখ দূর হইবে না।

দেশের শিক্ষা সমাপন করিয়া আই. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র বিলাত গমন করিলেন। তিনি সেখানে উক্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত কৃতকার্য হইলেন এবং একটি ভাল চাকরিও

পাইলেন। কিন্তু ভারতবাসীর উপর ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের দরুন তাহার মন বিষাইয়া উঠিল। তাই তিনি স্থির করিলেন ইংরেজের অধীনে চাকুরি করিবেন না, দেশে ফিরিয়া দেশ ও দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

তখন ভারতবাসীরা স্বাধীনতা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়াছে। তিনিও এই আন্দোলনে তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহাকে এজন্য বহুবার কারাবরণ করিতে হইয়াছে। অহিংসনীতিতে তাহার আস্থা ছিল না। কিছুদিন পর গান্ধীজীর সহিত তাঁহার মতভেদ দেখা দেয়। তখন তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন।

ভারতবাসীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ-সরকার বহুদিন পূর্বে কলিকাতায় 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। সুভাষচন্দ্র অন্যায়কে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিবার পাত্র ছিলেন না। তাহার জীবনটাই ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। বিকৃত ইতিহাসের এই স্মৃতিস্তম্ভ সরাইবার জন্য তিনি আরম্ভ করিলেন 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' আন্দোলন। তাঁহার

আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার এই স্মৃতিস্তম্ভ সরাইয়া নিতে বাধ্য হইল। অতপর তিনি প্রকাশ্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইল। এবার তিনি আমরণ অনশন শুরু করিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যহানির ভয়ে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে স্ব-গৃহে অন্তরিত করিলেন। তাঁহার গৃহের চারিদিকে কড়া পুলিশ পাহারা বসিয়া গেল।

এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র ভাবিলেন ইংরেজ এখন বিপর্যস্ত, সুতরাং ইংরেজকে এ-দেশ হইতে তাড়াইবার এখনই সুবর্ণ সুযোগ। এসময় ভারতে বিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরেজ ভারত-ত্যাগে বাধ্য হইবে।

হঠাৎ একদিন দেশবাসী পরম বিস্ময়ের সহিত শুনিল—সুভাষচন্দ্র ঘরে নাই। চতুর্দিকে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগে চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাহারা তাঁহাকে ধরিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল। কিন্তু কোথায় মিলিবে তাঁহার সন্ধান। তিনি রহস্যজনক ভাবে ভারত হইতে বহুদূরে ইউরোপে চলিয়া গেলেন। তিনি বার্লিনে গিয়া হিটলারের বন্ধু হিসাবে বাস করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন শুনা গেল তিনি বার্লিন হইতে ডুবোজাহাজে সিঙ্গাপুরে গিয়াছেন। তিনি সেখানকার ভারতীয় লোক ও সিপাহীদের লইয়া নূতন করিয়া এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। নূতন আশায়, নূতন উদ্যমে, তাহারা সুভাষচন্দ্রের পাশে দাঁড়াইল। তাহারা ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজদের তাড়াইয়া স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল। এই মুক্তিকামী সেনাদলের নাম ছিল, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। তাহারা তাহাদের নেতা সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী বলিয়া অভিবাদন করিল। বাংলার সুভাষচন্দ্র ভারতের 'নেতাজী' হইলেন।

পবিত্র মাতৃভূমিকে বিদেশীর বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত এই সেনাবাহিনী ভারতের দিকে রওয়ানা হইল। মুখে তাহাদের এক ধ্বনি—"জয় হিন্দ"। চোখের সামনে এক পথ, "দিল্লী চলো"। তাহারা ভারতের প্রান্তসীমা মণিপুরে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহাদের সহিত ইংরেজ-সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হইল। প্রকৃতি তখন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিল।

হঠাৎ আকাশে ঘন মেঘ দেখা দিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। পথ-ঘাট সব জলে ডুবিয়া গেল। গোলাবারুদ জলে ভিজিয়া গেল। আজাদ-হিন্দ বাহিনীর পরাজয় ঘটিল। নেতাজী ব্যর্থমনোরথ হইয়া রণাঙ্গন ত্যাগ করিলেন।

কিছুদিন পর শোনা গেল 'তাইহকু' বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

কিন্তু নেতাজীর সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। ভারত আজ স্বাধীন। ভারতের স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাসে তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। তাই ভারতবাসীর হৃদয়ে তাঁহার আসন চির অম্লান থাকিবে। তিনি আমাদের দেশের গৌরব, তিনি আমাদের চিরকালের প্রিয় নেতা নেতাজী সুভাষ। তাঁহার মৃত্যু নাই। তিনি চির-অমর।

অনুশীলনী

১। সুভাষচন্দ্রের পিতার নাম কি? তিনি কি ছিলেন?
২। সুভাষচন্দ্রের 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান?
৩। সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' বলা হইত কেন?
৪। নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' সম্বন্ধে কি জান?
৫। ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে নেতাজীর অবদান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

রাজা রামমোহন রায় ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের জন্য ধন্য যে হুগলী সেই হুগলীর ছোট একটি গ্রাম দেবানন্দপুর। বাংলার বরেণ্য কবি ভারতচন্দ্র একদিন এই দেবানন্দপুরের বন্দনা গাহিয়াছেন। বিদ্যায়, স্বাস্থ্যে, সম্পদে এবং জনকোলাহলে ও আনন্দ-উৎসবে ইহা একদিন মুখরিত ছিল। গ্রামটি অতি ছোট। পূর্ব রেলওয়ের ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে মাইল দুই উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর সেই সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেবানন্দপুরের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেন। শরৎচন্দ্র সেখানে কিছুকাল অধ্যয়ন

করেন। পাঠশালার ছাত্রদের মধ্যে তিনি যেমনি ছিলেন মেধাবী, তেমনি ছিলেন দুরন্ত।

ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া শরৎচন্দ্র ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুরের জেলা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এণ্ট্রান্স পাস করিয়া শরৎচন্দ্র কলেজে ভর্তি হইলেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি টাকার অভাবে কলেজের পাঠ্য বইও কিনিতে পারেন নাই। তিনি বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে বই চাহিয়া আনিয়া রাত্রি জাগিয়া পড়িতেন এবং সকালেই বই ফেরৎ দিয়া আসিতেন। কলেজে এইভাবে দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়াও টেষ্ট পরীক্ষার পর এফ. এ. পরীক্ষার ফি মাত্র কুড়ি টাকা যোগাড় করিতে না পারায়, তাঁহার আর এফ, এ. পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

অবশেষে শরৎচন্দ্র চাকরির উদ্দেশ্যে রেঙ্গুন যাত্রা করেন। তিনি রেঙ্গুনে পাবলিক ওয়ার্কস একাউণ্টস অফিসে চাকরি পান। রেঙ্গুনে থাকার সময় তিনি বেশীর ভাগ সময়ই থাকিয়াছেন শহরের উপকণ্ঠে। সেখানে প্রধানতঃ কলকারখানার মিস্ত্রীরা থাকিত। তিনি মিস্ত্রীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন এবং তাহাদের বিপদে সাহায্যও করিতেন। মিস্ত্রীরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিত এবং 'দাদাঠাকুর' বলিয়া ডাকিত। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি হঠাৎ দুরারোগ্য পা-ফোলা রোগে আক্রান্ত হন এবং রেঙ্গুন ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি হাওড়া বাজে শিবপুরে অবস্থান করেন। সেই সময় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি অহিংস কংগ্রেসের নেতা হইলেও বরাবরই ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সহিতও যোগাযোগ

রাখিতেন এবং উক্ত দলের বিখ্যাত নেতাদের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তিনি বহু বিপ্লবীকে অর্থ সাহায্য করিতেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে বিশিষ্ট উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করেন। ইহার পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক উপহার দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া দেশবাসী তাঁহার বিখ্যাত সাহিত্যসৃষ্টির জন্য তাঁহাকে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্র সারা জীবন বহু গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। উপন্যাসগুলির মধ্যে পল্লীসমাজ, শ্রীকান্ত, বড়দিদি, মেজদিদি, বিন্দুর ছেলে, দেবদাস, পথের দাবী, চরিত্রহীন, শেষপ্রশ্ন ইত্যাদি এবং ছোট গল্পের মধ্যে মহেশ, রামের সুমতি ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গল্প ও উপন্যাস বাঙ্গালী পাঠক সমাজের নিকট অতি সমাদর লাভ করিয়াছে। এই জনপ্রিয়তা ও সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে বাঙ্গালী সমাজের দৈনিক জীবনের চিত্র অতি নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কন করিবার তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা।

তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে একজন দরদী মানুষ। মানুষ, এমন কি জীবজন্তুর দুঃখদুর্দশা দেখিলে বা তাহাদের দুঃখের কথা শুনিলে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িত। সমাজের অত্যাচারিত লোকদের প্রতি তাঁহার করুণার অন্ত ছিল না।

শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য জীবনের শেষ কয় বৎসর মোটেই ভাল যাইতেছিল না। তিনি একটা-না-একটা রোগে ভুগিতেছিলেন। অবশেষে তিনি ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হন এবং সেই রোগেই মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬১ বৎসর চার মাস।

শরৎচন্দ্রের তিরোধানে সেদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তরের কথা নিম্নলিখিত কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটি থেকে নিলে যারে হরি,
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি' ॥

অনুশীলনী

১। শরৎচন্দ্র কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁহার পিতামাতার নাম কি?
২। শরৎচন্দ্রকে 'মানব দরদী' বলা হয় কেন?
৩। 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' কাহাকে বলা হয় এবং কেন? তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস ও ছোটগল্পের নাম কর।
৪। শরৎচন্দ্রের দেশানুরাগ সম্বন্ধে কি জান?
৫। শরৎচন্দ্র কি রোগে মারা যান? মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল কত?

তোমরা নিশ্চয়ই কাজী নজরুল ইসলামের নাম শুনিয়াছ। তিনিই বিদ্রোহী কবিরূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ফকির আহমদ্‌, মাতার নাম জাবেদা খাতুন। তাঁহার বাল্যনাম ছিল দুখু মিঞা। আট বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। তাঁহাকে অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতে হয়। এই জন্য তাঁহার বেশী দিন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ হয় নাই। তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি 'লেটো' সংগীত দলে যোগদান করেন। গান রচনায় তাঁহার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। হিন্দু পুরাণ ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং পরে সাধারণ সৈনিক হইতে হাবিলদারের পদে উন্নীত হন। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁহার সাহিত্য সাধনার উন্মেষ হয়। ১৯২০ সনে তিনি সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কাব্য ও সংগীত-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সমাজে বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া গাহিয়াছিলেন, "প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে

খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস ; যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ।" তিনি 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান' ইত্যাদি অগ্নিবর্ষী কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কাব্যের মাধ্যমে সমাজের অসাম্য ও রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অগ্ন্যুদগার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক চনা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এক বৎসর তাঁহার সশ্রম কারাদণ্ড হ। রাজনৈতিক শৃঙ্খল মোচনের জন্য তীব্রতম আবেগ তাঁহার বহু কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি গাহিয়াছেন, "আমি সেই দি হব শান্ত, যেদিন উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না।" 'বিদ্রোহী' ও 'কামাল পাশা' কবিতা প্রকাশের পরই তাঁহার কবিখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

াহার লেখা "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" বাঙালী তরুণদের মনে অপূর্ব প্রের দান করিয়াছিল। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন,

"আয় চলে আয় রে ধূমকেতু, আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।"

নজরুল শুধু কবিতা ও গান লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি নাটক ও ছোট গল্পের বইও লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত গানগুলি সংখ্যায় যেমন প্রচুর, উৎকর্ষে তেমনি অতুলনীয়। তিনি যেখানে হাত দিয়াছেন সেখানেই সোনা ফলাইয়াছেন। তাঁহার লিখিত কবিতা হইতে ভারতের বহু নেতা ও কর্মী স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলে। তিনি মুসলমান হইলেও তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমান ভেদ-বুদ্ধির স্থান ছিল না। তাঁহার বহু কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা উল্লেখ আছে। তিনি

গাহিয়াছিলেন, "হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের সন্তান। হিন্দু তার নয়ন-মণি মুসলমান তার প্রাণ।" ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

নজরুলের জীবনের শেষ অধ্যায়টি বড়ই করুণ। ১৯৪২ সনে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার বাক্‌শক্তি ও লেখনী বন্ধ হইয়া যায়। ৩৪ বৎসর কাল নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় জীবন যাপনের পর তিনি ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগষ্ট বাংলা দেশের ঢাকা হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্তি, অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।

অনুশীলনী

১। কাহাকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়? তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে কি জান?

২। নজরুলের কয়েকটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম কর।

৩। নজরুলের শেষ জীবন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

মেদিনীপুর জেলার একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের নাম হোগলী। এই গ্রামের অধিকাংশই ছিল চাষী পরিবার। এখানে ঠাকুরদাস মাইতি নামে জনৈক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি কায়ক্লেশে সংসার চালাইতেন। ১৮৬৯ সাল ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় সাল। এই সালে ঠাকুরদাসের একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাঁহার নাম রাখা হইল মাতঙ্গিনী। ঠাকুরদাস আদর করিয়া তাহাকে 'মাতু' বলিয়া ডাকিতেন। মাত্র নয় বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি স্বামীকে হারাইলেন। অতঃপর তিনি দেশের মুক্তি আন্দোলনের সৈনিক হইলেন। ভারতকে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত করিবার জন্য যাঁহারা অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৪২ সনে মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই আন্দোলন সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর ইহাতে গ্রহণ করিয়াছিল এক বিশিষ্ট ভূমিকা। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। বাঙলা দেশের উপর জাপানী আক্রমণ আসন্ন। ইংরেজ তাই নৌকা, সাইকেল আটক করিতেছে

সৈন্যদের খাদ্যের জন্য দূরে সরাইয়া দিতেছে ধান-চাল। এমনি ধান-চাল সরাইবার সময় মেদিনীপুরবাসীদের সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষ ঘটিল। গুলি চলিল। প্রতিবাদে মেদিনীপুরে হরতাল ঘোষিত হইল। মেদিনীপুরবাসীরা সেইখানেই থামিলেন না। তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে সরকারী থানা, ডাকঘর, রেলস্টেশন পোড়াইতে লাগিলেন। রেললাইন তুলিয়া ট্রেন-চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিলেন, বিদ্যুৎ-সরবরাহ অচল করিয়া দিলেন।

ইংরেজও বালক, বৃদ্ধ, নারী—কোনো কিছুর বিচার না করিয়া সকলের উপরেই চালাইতে লাগিল লাঠি, গুলি, বেয়নেট। উহারা লোকের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিল, বাস্তুভিটা লাঙ্গল দিয়া চষিয়া সমভূমি করিল এবং লোকজনদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিল।

ইহারই মধ্যে একদিন মেদিনীপুরের তমলুকে বিপ্লবীদের এক বিরাট মিছিল বাহির হইল। সমবেত বহু নারী-পুরুষের মিছিল।

সরকারী পুলিস আর সৈন্য আসিয়া শোভাযাত্রীদের বাধা দিল। তাহাদের হাত হইতে জাতীয় পতাকা ফেলিয়া দিতে বলিল।

এত বড় স্পর্ধার কথা? জাতীয় পতাকা হাত হইতে ফেলিয়া দিতে হইবে? মুহূর্তের মধ্যে সেই মিছিলের ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিলেন মেদিনীপুরবাসিনী তিয়াত্তর বছরের এক বৃদ্ধা রমণী। তাঁহার নাম মাতঙ্গিনী হাজরা। হাতে তাঁহার ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা। তিনি বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া বলিলেন, "কখনও না, মিছিল আমরা বন্ধ করিব না, প্রাণ থাকিতে হাত হইতে জাতীয় পতাকাও নামাইব না।" তারপর তিনি শোভাযাত্রীদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা নির্ভয়ে সকলে আগাইয়া চল। বল, বন্দেমাতরম্।"

সহস্র কণ্ঠ গর্জন করিয়া উঠিল, "বন্দে মাতরম্।" সেইসঙ্গে

সরকারী সৈন্যদের বন্দুকও। দুইটি গুলি আসিয়া লাগিল মাতঙ্গিনীর হাতে। তিনি অন্য হাতে পতাকা ধরিয়া আগাইয়া চলিলেন। আশ-পাশে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলিতেছে। গুলিতে আহত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছেন বহু শোভাযাত্রী। মাতঙ্গিনীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন তিয়াত্তর বছরের সেই বৃদ্ধা, হাতে তাঁহার বজ্রমুষ্টিতে-ধরা জাতীয় পতাকা, মনে তাঁহার অসীম বল।

হঠাৎ একটা গুলি আসিয়া তাঁহার বুকে বিঁধিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। কিন্তু হাতের জাতীয় পতাকাটি তখনও উঁচু করিয়া ধরা।

আজ স্বাধীন ভারতের আকাশে গর্বভরে উড়িতেছে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। সেই পতাকার সঙ্গে দুলিতেছে বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরার সেদিনকার আত্মদানের কাহিনী। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর শহীদ এই মাতঙ্গিনী হাজরা।

এই বীর রমণী আজ আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু দেশবাসী তাঁহাকে চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

অনুশীলনী

১। মাতঙ্গিনী হাজরা কে? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁহার পিতার নাম কি?

২। মাতঙ্গিনী হাজরা কাহাদের গুলিতে নিহত হন?

৩। তাহাকে 'শহীদ' বলা হয় কেন?

৪। মাতঙ্গিনী হাজরার বীরত্বব্যঞ্জক কাজ সম্বন্ধে কি জান?

নিবেদিত একটি প্রাণ

[মা টেরেসা]

জগতে সব দেশেই স্বদেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু আদর্শের দিক হইতে বিদেশকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই সেবায় নিঃস্বার্থভাবে এবং নিঃশেষে সমর্পিত প্রাণের সংখ্যা অতি বিরল। মা টেরেসা তাঁহাদের একজন। মা টেরেসা এক বিশ্ব-বিশ্রুত নাম। মানব-সেবার আদর্শ জীবনে গ্রহণ করিয়া তিনি অসামান্য কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। সাধারণ সংসারের মধ্যেও যে অসাধারণ কিছু থাকিতে পারে উহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার জীবনে।

টেরেসার ব্যক্তি-পরিচয় অতি সামান্য, কিন্তু অলৌকিক বিস্ময়ে ভরা। তাঁহার পিতৃভূমি ছিল আলবেনিয়া। সাধারণ কৃষক পরিবারে তাঁহার জন্ম। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এক ভাই ও দুই বোন ছিল। সাত বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে চলিয়া আসেন। শিয়ালদহ হইতে পার্কসার্কাসের দিকে ট্রামে তিন-চারিটি স্টপ। এর পরেই ইণ্টালি। মা টেরেসা এই ইণ্টালি অঞ্চলে সেণ্ট মেরি হাই-স্কুলে ভূগোলের শিক্ষিকা রূপে কাজ করেন। এই স্কুলেই শিক্ষকতায় তাঁহার হাতে খড়ি। এখানে কাজ করার সময় আশপাশের বস্তির লোকদের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার মন কাঁদিয়া উঠিল। ১৯৪৮ সনে তিনি ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলেন। ভারতীয় নারীদের মত শাড়ী পরিলেন। আজও সেই নীল পাড়ের শাড়ী তাঁহার

পরিচ্ছদ। মাত্র পাঁচটি টাকা সম্বল করিয়া তিনি দরিদ্র-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অজস্র সেবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন। প্রভূত উদ্যম নিয়া তিনি এই সত্তর বৎসর বয়সেও দরিদ্র-সেবায় নিজকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন।

'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' এই উক্তিটি স্বামী বিবেকানন্দের এবং ইহা বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল ভগিনী নিবেদিতার কণ্ঠে। মা টেরেসা এই কথার অর্থ পুরাপুরি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এবং উহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মা টেরেসা যেন দ্বিতীয়া নিবেদিতা রূপে ভারতের সেবাকার্যে নিযুক্তা। তিনি কলিকাতার কালীঘাট, ইণ্টালি, তিলজলা, দমদম, টিটাগড়, আসানসোল. জলপাইগুড়ি ইত্যাদি স্থানে সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া মানব-সেবার কাজ করিতেছেন। তিনি সেবা, প্রেম ও করুণার আদর্শকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৭৯ সালে তিনি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ইহা ছাড়াও, তিনি তাঁহার অসামান্য সেবাকার্যের জন্য বহু পুরস্কার পাইয়াছেন। পুরস্কারের সব অর্থই তিনি মানব-সেবার জন্য ব্যয়

করিয়াছেন। মানব-সেবার ভিতর দিয়াই যে মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে টেরেসার জীবন তাহারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি আজ বিশ্ব-বরেণ্যা। সবচেয়ে বিস্ময়কর হইল তাঁহার সাধারণত্ব। এই গুণই তাঁহাকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার জীবন অতি সহজ, সরল। তাঁহার মানবসেবার সংকল্প অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে। তাঁহার সংকল্প সাধু। অতএব ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইবেন। এই মহীয়সী নারী দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া মানবসেবায় ব্রতী থাকুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

মা টেরেসার নিকট আমরা ভারতবাসী মাত্রই অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ। এই বিদেশিনী মহিলা যথার্থই ভারত-প্রাণা। এই পূত চরিত্রা মহিলা আমাদের প্রণম্যা।

অনুশীলনী

১। মা টেরেসা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

২। মা টেরেসার সেবা-কার্য সম্বন্ধে কি জান ?

৩। তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন ?